দুর্গেশনন্দিনী

'দুর্গেশনন্দিনী' বঙ্কিমের প্রথম রসন্যাস (Romance)। প্রথম চেষ্টায় ভাষা, ভঙ্গি, আখ্যানবস্তুর বিন্যাস, পারিপাট্য ইত্যাদিতে যে সকল ত্রুটি থাকা স্বাভাবিক, তাহা হয়তো ইহাতে আছে। সর্বাঙ্গ-সুন্দর সৃষ্টি ইহা হয় নাই। ইহার কতক অংশ ইতিহাস, কতক অংশ কাব্য, কতক অংশ নাটক। চরিত্র-সৃষ্টির দিক হইতেও ইহা সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ করে নাই।

তবু এই পুস্তকের মূল্য অনেক বেশি। কেবল বঙ্কিমের সাহিত্য সাধনার দিক্ হইতে নয়—বঙ্গ-সাহিত্যের ইতিহাস ও তাহার ক্রমোন্মেষের দিক্ হইতে বিচার করিলে এই গ্রন্থের মূল্যের অবধি নাই।

ডা. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায়—

> যে পথ দিয়া দুর্গেশনন্দিনীর অশ্বারোহী পুরুষটি অশ্বচালনা করিয়াছিলেন, তাহা প্রকৃতপক্ষে রোমান্সের রাজপথ এবং বঙ্গ উপন্যাসে প্রথম বঙ্কিমচন্দ্র এই রাজপথের রেখাপাত করিয়াছিলেন।

তাজমহলের ভিত্তির যে মূল্য, বাঙ্গালা কথাসাহিত্যের পক্ষে ইহার মূল্য তদ্রূপ। যে দেশে কথা-সাহিত্য বলিয়া বিশেষ কিছু ছিল না—সে দেশের কথাসাহিত্যের প্রথম পুস্তক এত উচ্চশ্রেণির কী করিয়া হইল তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। সত্য কথা বলিতে গেলে, বঙ্কিম কথাসাহিত্যের কোনো আদর্শ এ দেশে প্রাপ্ত হন নাই—বঙ্কিমকে একপ্রকার শূন্য হইতেই এই রসবস্তুর সৃষ্টি করিতে হইয়াছে—এবং এই সৃষ্টি শ্রেষ্ঠ না হউক—অপকৃষ্টও হয় নাই। এই কথা ভাবিলে বঙ্কিমের প্রতিভার অসাধারণতা লক্ষ করিয়া শ্রদ্ধায় শির অবনত হইয়া পড়ে।

শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন—

> এ জাতীয় উপন্যাস বাঙ্গালাতে কেহ অগ্রে দেখে নাই। আমরা তৎপূর্ব্বে বিজয়বসন্ত, কামিনীকুমার প্রভৃতি কতিপয় সেকেলে কাদম্বরী ধরনের উপন্যাস, গার্হস্থপুস্তক প্রচার সভার প্রকাশিত হংসরূপী রাজপুত্র, চক্‌মকির বাক্স প্রভৃতি কয়েকটি ছোটোগল্প এবং আরব্য উপন্যাস প্রভৃতি কয়েকখানি উপকথা গ্রন্থ আগ্রহের সহিত পড়িয়া আসিতেছিলাম।

—এ সকল গ্রন্থ হইতে বঙ্কিম কোনো আদর্শই লাভ করেন নাই।

আচার্য অক্ষয় সরকার মহাশয় লিখিয়াছেন,—

> কাশীদাস, কৃত্তিবাস, ভারতচন্দ্র, কবিকঙ্কণ, হাতেম তাই, চাহার দরবেশ প্রভৃতি বটতলার প্রকাশিত গ্রন্থ হিন্দু-মুসলমান উভয় শ্রেণির পুরুষেরা কিনিত। মেয়েরাও জীবনতারা, কামিনীকুমার ইত্যাদি গ্রন্থ ক্রয় করিত।

বঙ্কিমচন্দ্র এই সকল গ্রন্থ হইতে কোনো সাহায্যই পান নাই। সরকার মহাশয় রামকমল ভট্টাচার্যের 'দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথাভ্রমণ' নামে একখানি পুস্তকের নাম করিয়াছেন।

Scanned with CamScanner

প্যারীচাঁদের 'আলালের ঘরের দুলাল'—অল্প দিন আগে প্রকাশিত হইয়াছিল। সরকার মহাশয়ের মতে এই পুস্তক দুখানির ভাষা বঙ্কিমের ভাষার জননী। যদি এ কথা সত্য হয়—তাহা হইলে বঙ্কিম এই পুস্তক দুইখানি হইতে আদর্শ বাংলা ভাষার সন্ধান পাইয়াছিলেন—এই কথা মাত্র স্বীকার করিতে হয়। উপন্যাস রচনার অন্য কোনো অঙ্গের দিক হইতে বঙ্কিম ওই পুস্তক দুইখানি হইতে কোনো সহায়তা লাভ করেন নাই। আর ভাষার কথাতেও বলিতে হয়—দুর্গেশনন্দিনীর ভাষার সঙ্গে ওই পুস্তক দুইখানির ভাষাভঙ্গির কোনো মিল নাই। বঙ্কিম পরবর্তী জীবনে যে ভাষাভঙ্গির প্রবর্তন করিয়াছিলেন, তাহার সহিতই ওই পুস্তক দুইখানির ভাষার যথেষ্ট সম্বন্ধ আছে।

মোটের উপর মাইকেলের 'মেঘনাদবধ' কাব্যরাজ্যে যে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিল—বঙ্কিমের 'দুর্গেশনন্দিনী' কথা-সাহিত্যের রাজ্যে সেই শ্রেণির যুগান্তর ঘটাইয়াছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র যে যুগের প্রবর্তক—'দুর্গেশনন্দিনী'তে সেই যুগের সূত্রপাত হইয়াছে—রবীন্দ্র-শরৎচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলি তাহারই অনিবার্য স্বাভাবিক সুপরিণতি। বর্তমান যুগের কথাসাহিত্যের পুষ্পপল্লবসমারোহের মূল ওই 'দুর্গেশনন্দিনী'।

বৈষ্ণবধর্মের ক্রমপরিণতির ইতিহাস লেখক ও বৈষ্ণবতত্ত্বের ব্যাখ্যাতা কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় যে শ্রদ্ধা-ভক্তির সহিত মাধবেন্দ্র পুরীর প্রেমধর্মজগতের রসসাধনার উল্লেখ করিয়াছেন —সেই শ্রদ্ধা-ভক্তির সহিতই আজ আমরা বর্তমান সাহিত্য সাধনার ক্ষেত্রে 'দুর্গেশনন্দিনী'র নামোল্লেখ করিতে পারি।

বঙ্কিম এ দেশের কোনো পূর্বসূরির নিকট ঋণী নহেন সত্য, কিন্তু ইউরোপের কথা সাহিত্যিকদের কাছে তিনি ঋণী। 'দুর্গেশনন্দিনী'র আখ্যানবস্তুর সহিত Scott-এর Ivanhoe-র আখ্যানবস্তুর মিল আছে। অনেকে মনে করেন—বঙ্কিম Scott-এর Ivanhoe-র অনুসরণেই 'দুর্গেশনন্দিনী' লিখিয়াছেন। সেকালের প্রথম গ্রাজুয়েট বঙ্কিম Scott-এর প্রধান গ্রন্থ Ivanhoe পড়েন নাই, এ কথা তাঁহারা বিশ্বাস করেন না। যাহাই হউক—বঙ্কিম নিজে যখন এ কথা অস্বীকার করিয়াছেন, তখন এ কথার উল্লেখ করাই ধৃষ্টতা। অশীতিপর বৃদ্ধ রায় বাহাদুর অঘোরনাথ অধিকারী মহাশয় বলেন—Ivanhoe সে কালে খুব আদরের পুস্তক ছিল—শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রই তাহা পাঠ করিতেন। বঙ্কিম Ivanhoe নিজে না পড়িলেও বন্ধুবান্ধবের মুখে Ivanhoe-র উপ্যাখ্যানটি শুনিয়া থাকিবেন। তিনি যৌবনকালে এইরূপ একটা কথা যেন শুনিয়াছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র যদি Ivanhoe-র গল্প শুনিয়াই 'দুর্গেশনন্দিনী' লিখিয়া থাকেন, তাহাতেও 'দুর্গেশ-নন্দিনী'র মৌলিকতার গৌরব বিন্দুমাত্র নষ্ট হয় নাই। আখ্যানবস্তুর কিয়দংশ Ivanhoe-র সঙ্গে মিলিলেও অন্য কোনো অংশে Ivanhoe-র সহিত 'দুর্গেশনন্দিনী'র মিল নাই।

এই গ্রন্থে বঙ্কিমের সৃষ্টির সমারোহময় নিজস্ব ঐশ্বর্য ও অপূর্ব মৌলিক ক্রম-পরিণতির চাতুর্যের মধ্যে আখ্যানবস্তুর কিয়দংশের ওই সাদৃশ্য কোথায় নিমগ্ন হইয়া গিয়াছে।

বঙ্কিম Ivanhoe না পড়িতে পারেন, কিন্তু Scott-এর কোনো কোনো গ্রন্থ নিশ্চয়ই পড়িয়াছিলেন। Dickens, Charlotte Bronte ইত্যাদি ঔপন্যাসিকের গ্রন্থও সম্ভবত তাঁহার অপরিচিত ছিল না এবং Chivalric যুগের বীর-ধর্ম, দ্বন্দ্বযুদ্ধের প্রথাপ্রসিদ্ধি ও শৌর্যের আদর্শের সঙ্গে তিনি ইংরেজি কাব্য, নাট্য ইত্যাদির মারফতে নিশ্চয়ই পরিচিত ছিলেন। এই পরিচয় তাঁহাকে সাহিত্য রচনায় যে আদর্শ দান করিয়াছিল, 'দুর্গেশনন্দিনী' সেই আদর্শেই গড়া। বঙ্কিমের রোমান্স ও উপন্যাস রচনার দীক্ষা

Scanned with CamScanner

ইউরোপীয় সাহিত্য- গুরুদের রচনা হইতে, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। বঙ্কিমচন্দ্র কঠোর তপস্যার দ্বারা যে ভাবমন্দাকিনীর ধারা পশ্চিম হইতে পূর্বে আনয়ন করিয়াছেন—তাহার সহিত এ দেশের সংকীর্ণ খাতে প্রবাহিত কোনো ভাবধারার সংযোগ নাই। এ দেশের কাব্যসাহিত্য-প্রবাহের সম্বন্ধে যাহা কতকটা সত্য, কথাসাহিত্য প্রবাহের সম্বন্ধে তাহা সত্য নয়।

'দুর্গেশনন্দিনী' হইতে বাঙ্গালার উপন্যাস-সাহিত্যের সূত্রপাত তো বটেই, ঐতিহাসিক উপাদানকে সাহিত্যে পরিণত করিবার চেষ্টাও বঙ্গসাহিত্যে ইহাই প্রথম। দিল্লির সম্পর্কে বাঙ্গালা দেশের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের উপাদান বঙ্কিমের কিছু কিছু অধিগম্য ছিল। সে উপাদান এত সামান্য যে, তাহাতে বহুল পরিমাণে কল্পনার উপাদান সংযোগ করিয়া বঙ্কিমকে এই উপন্যাস রচনা করিতে হইয়াছে। ইতিহাসের পাত্রপাত্রীর সহিত কল্পনার নর-নারীর মিলন ঘটাইতে যে মনীষা ও ঐতিহাসিক মানসিকতার প্রয়োজন, বঙ্কিমের তাহা ছিল। সামান্য ও অস্পষ্ট উপাদান উপকরণ হইতে বঙ্কিম প্রাচীন দেশ ও কালকে অনুমান ও কল্পনার সাহায্যে মনের মধ্যে পরিপূর্ণভাবে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। অঙ্গ-বিশেষ হইতে অঙ্গীকে গড়িয়া তুলিবার শক্তি ছিল বঙ্কিমের অসাধারণ। বঙ্কিমের এই শক্তি ছিল বলিয়া—তিনি কল্পনার নর-নারীর সহিত ঐতিহাসিক পাত্র-পাত্রীর অপূর্ব মিলন ঘটাইতে পারিয়াছিলেন—দেশ-কালোপযোগী পরিবেষ্টনী ও পটভূমিকা রচনা করিতে রাজপুত, বাঙ্গালী হিন্দু ও পাঠান জাতিকে একটি বিরাট মহাজাতি সংসারের পরিজনরূপে দেখাইতে এবং বিগত যুগের স্মৃতি ও স্বপ্নে জীবন সঞ্চার করিতে পারিয়াছিলেন। দেশের ইতিহাসের অধিকাংশ যখন মাটির তলে, তখনই বঙ্কিম দেশের প্রাচীন যুগ বিশেষকে ধ্যানরূপ দিয়া গড়িয়াছিলেন—আজিকার দিনেও তাঁহার সৃষ্টিকে সমুদ্ধৃত ইতিহাসের পরীক্ষায় অস্বাভাবিক বলিবার উপায় নাই। বঙ্কিমের মনীষা ও সৃজন-প্রতিভা কত বড়ো ছিল, ইহা হইতেই অনুমেয়।

'দুর্গেশনন্দিনী'তে অনেক ত্রুটি আছে সত্য, কিন্তু উপন্যাস, বিশেষত ঐতিহাসিক রসন্যাস গড়িয়া তুলিবার জন্য যে কল্পনাশক্তির প্রয়োজন—তাঁহার সে শক্তির পরিচয় ইহাতে প্রচুর পরিমাণেই আছে—কোথাও তাহা অবসন্ন বা নিস্তেজ হইয়া পড়ে নাই।

'দুর্গেশনন্দিনী'তে আর যে বস্তুর অভাব থাকুক—কল্পনার লীলা বৈচিত্র্যের অভাব নাই।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্লট গড়িবার অদ্ভুত ক্ষমতা 'দুর্গেশনন্দিনী' হইতেই আমরা লক্ষ করি। দুর্গেশনন্দিনীর প্লটে যে কোথাও অঙ্গহানি নাই, ফাঁক নাই, অসম্ভব ও অস্বাভাবিকতার সন্নিবেশ নাই, তাহা নহে। বঙ্কিমচন্দ্র যতদূর সম্ভব স্বাভাবিকতা রক্ষা করিবারই চেষ্টা করিয়াছেন। স্মরণ রাখিতে হইবে—বঙ্কিমের কথার ধারা এই গ্রন্থে কী দুরূহ, জটিল, উচ্চাবচ দুর্গম পথ দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। প্রহরীবেষ্টিত হিন্দুদুর্গাধিপতির অন্তঃপুর ও পাঠান নবাবের অন্তঃপুরের মধ্য দিয়া রক্তপিচ্ছিল পথে তাঁহার কল্পনাকে কত সন্তর্পণে চলিতে হইয়াছে। বঙ্কিম সাধ করিয়া যে দুর্গমতার ও জটিলতার জাল সৃষ্টি করিয়াছেন—তাহা ভেদ করিয়া তাঁহার আখ্যান-যাত্রীকে অগ্রসর হইতে হইয়াছে। তাঁহার কথাবস্তুর যাত্রাপথের দুর্গমতার কথা ভাবিলে তাঁহার স্খলনাদির কথা আর মনে থাকে না।

Scanned with CamScanner

পাঠকের কল্পনাকে বঙ্কিম অতীত যুগের শূন্যপথে লইয়া গিয়াছেন—কল্পনা যাহাতে যাত্রাপথে আশ্রয় পায়, সে জন্য তিনি কেবল ঘটনার শৈল-শিখরের উপরই নির্ভর করেন নাই—তিনি অজস্র চিত্রের সৃষ্টি করিয়া ঘটনার শিলাপুঞ্জকে মোহনশ্রীতে সমাচ্ছন্ন করিয়াছেন। ঘটনা পরম্পরার দ্বারা যে কথাসাহিত্যের সৃষ্টি—তাহাতে যথাযোগ্য প্রাকৃতিক আবেষ্টনী ও চিত্রবাহুল্য না থাকিলে যে তাহা ইতিহাসের ফিরিস্তি হইয়া পড়িবে, এ সত্য বঙ্কিমচন্দ্র গোড়া হইতেই বুঝিতেন।

পাঠকের কৌতূহলকে সদাপ্রবুদ্ধ রাখার জন্য আখ্যানভাগের কোথায় কোথায় ফাঁক দিতে হইবে—কোথায় কতটা অংশ অকথিত রাখিতে হইবে—বিবিধ অংশের কোন্‌টা আগে কোন্‌টা পিছে বসাইতে হইবে—আগে ইঙ্গিতে আভাসে বলিয়া কোথায় পূর্ণ বিবৃতি দিতে হইবে—বঙ্কিম গোড়া হইতেই বুঝিতেন।

'দুর্গেশনন্দিনী'র ন্যায় রসন্যাস দ্রুতগামী ঘটনা-পরম্পরার দ্বারাই সংগঠিত। এই রসন্যাসে ঘটনাই যেন প্রধান, চরিত্রগুলি আনুষঙ্গিক। চরিত্রগুলি যেন ঘটনার বশবর্তী—ঘটনারই ক্রীড়নক। তিলোত্তমার কোনো ব্যক্তিত্ব নাই—তাহার জীবন সম্পূর্ণ ঘটনানুগামী দৈবাধীন। বিমলার পক্ষচ্ছায়ায় সে আচ্ছন্ন। আয়েষা একটা ভাবাদর্শ মাত্র—একটি ভাবাদর্শকে বঙ্কিম আয়েষার বাক্রয়ী মূর্তি দিয়াছেন মাত্র, ঠিক রক্তমাংসের দেহধারণ সে করে নাই। নারী-চরিত্রের মধ্যে বিমলাই পুস্তকের প্রাণস্বরূপ। বিমলা হাস্যে পরিহাসে, ধূর্ততায়, ভুলভ্রান্তিতে, নৃত্যগীতে, বেশভূষায়, রূপে, যৌবনে, তেজস্বিতায়, পাতিব্রত্যে, স্থৈর্যে, ধৈর্যে ও প্রতিহিংসায় জীবন্ত। বিমলার জীবনকে সূত্রস্বরূপ অবলম্বন করিয়াই গ্রন্থের প্লট দানা বাঁধিয়াছে।

পুরুষচরিত্রগুলির মধ্যে বীরেন্দ্রসিংহ, জগৎসিংহ ও ওসমানই উল্লেখযোগ্য। জগৎসিংহ-চরিত্রে ইউরোপীয় শৌর্যযুগের নাইটগণের (Knight) চরিত্রদৃঢ়তা দৃষ্ট হয়। আদর্শ রাজপুতবীর বলিতে আমরা যাহা বুঝি, জগৎসিংহ তাহাই। রাজপুতানার ইতিহাসে এইরূপ চরিত্রের আমরা পরিচয় পাই বলিয়া এ চরিত্র আমাদের কাছে অবাস্তব হইয়া উঠে নাই। জগৎসিংহের তুলনায় বীরেন্দ্রসিংহের চরিত্র-দৃঢ়তা আরও বেশি, অথচ জগৎসিংহের চরিত্রে যে অবাস্তবতার একটা স্বপ্নচ্ছায়া আছে, বীরেন্দ্র চরিত্রে তাহা নাই। ওসমান চরিত্রটিও জীবন্ত। শৌর্যে ওসমান জগৎসিংহের যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী। বঙ্কিম শেষপর্যন্ত ওসমান-চরিত্রের বীরমর্যাদা রক্ষা করেন নাই। জগৎসিংহকে পদাঘাত করিয়া ওস্‌মান শৌর্যের আদর্শে হীন হইয়া পড়িয়াছে। ওসমান সাধারণ মানুষমাত্র—দেবতা নহে—তাহার প্রেমের গভীরতা ও উদ্দীপনা সাধারণ মানুষেরই মতো। ওসমান বীরধর্মের আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইয়াছে—কিন্তু রক্তমাংসে জীবন্ত মানুষ হইয়া উঠিয়াছে।

বঙ্কিম হাস্যরসিকতাকে কথাসাহিত্যের একটি প্রধান অঙ্গ বলিয়া জানিতেন। এই রঙ্গ-রসিকতা, তাঁহার অনেক গ্রন্থে ওতপ্রোতভাবে অনুস্যূত হইয়া আছে। বঙ্কিমের পূর্বে ও সমসাময়িক সময়ে যাঁহারা নাটক লিখিতেন—তাঁহারা রঙ্গরসিকতার জন্য পৃথক একটি চরিত্রেরই সৃষ্টি করিতেন। দুর্গেশনন্দিনীতে বঙ্কিম সেই ধারারই অনুসরণে গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজের চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন। গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজের দ্বারা 'দুর্গেশনন্দিনী'র শিল্পকলার ঐশ্বর্য কিছুই বাড়ে নাই।

Scanned with CamScanner

যে শ্রেণির রসিকতার ধারা বাংলাদেশে প্রচলিত ছিল—বঙ্কিমবন্ধু দীনবন্ধুর নাটকে যে ধারার পরিসমাপ্তি হইয়াছে—বঙ্কিমের দুর্গেশনন্দিনীকেও তাহা স্পর্শ করিয়াছে। রসিকতার যে সুরুচিসংগত আদর্শ বঙ্কিম বঙ্গসাহিত্যে পরে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, সে সৌরুচ্য আশ্‌মানি-দিগ্‌গজের প্রেমচিত্রে (?) পাওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমকে যে 'নির্ম্মল শুভ্র সংযত হাস্যরসের প্রবর্তক' বলিয়াছেন—'দুর্গেশনন্দিনী'তে তাহার প্রবর্তন হয় নাই।

আজকাল অনেকে বঙ্কিমকে অতিরিক্ত শুচিবাগীশ ও বর্ণাশ্রমের পাণ্ডা-পূজারি বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, আমরা তাঁহার প্রথম উপন্যাসেই দেখি—তিনি মনে-প্রাণে তাহা ছিলেন না, বরং তিনি সর্ববিষয়ে অসংকোচ উদারতায় উন্নতশীর্ষ আধুনিক সাহিত্যের যুগধর্মেরই প্রবর্তক—বর্তমান যুগের নৈতিক জীবনাদর্শের তিনি গুরুগোঁসাই।

বঙ্কিম দেখাইয়াছেন—প্রেমের পথ বর্ণাশ্রমী-শাসননিষ্ঠ সমাজের বাঁধা রাজপথ নয়। প্রেম সর্বত্রই বিদ্রোহী—সে কুটিল, বন্ধুর, দুর্গম ও পিচ্ছিল পথ ধরিয়াই চলে। সামাজিক বিধিনিষেধ মানিয়া চলে নাই বলিয়া প্রেম কোথাও বঙ্কিমের কাছে অশ্রদ্ধেয় হইয়া উঠে নাই। প্রেমের স্থান যে জাতিধর্মবর্ণগত সংস্কারের উপরে, বঙ্কিমই এ কথা আমাদের দেশে প্রথম শুনাইয়াছেন।

বীরেন্দ্রসিংহ পিতার অমতে দুইটি বিভিন্ন জাতীয় নর-নারীর মিলনে উৎপন্ন জারজা কন্যাকে গোপনে বিবাহ করিলেন। তাঁদের মিলনে উৎপন্ন তিলোত্তমাকেই বঙ্কিম এই গ্রন্থে প্রধান নায়িকার গৌরব দান করিয়াছেন।

বীরেন্দ্রসিংহ সামাজিক অপরাধের জন্য বঙ্কিমের লেখনীতে অবজ্ঞাত হন নাই। যেভাবে তিনি মৃত্যুবরণ করিলেন—তাহাতে দেখা যায়, বঙ্কিম তাঁহাকে বীরেন্দ্রের মর্যাদাই দান করিলেন। বিমলাও ওইরূপ জারজাতা এবং শূদ্রী-গর্ভজাতা। তাঁহাকে বীরেন্দ্রসিংহের অঙ্কলক্ষ্মীর মর্যাদা দিতে বঙ্কিম কুণ্ঠা প্রকাশ করেন নাই।—শুধু তাহাই নহে, বিমলাকেই বঙ্কিম 'দুর্গেশনন্দিনী'তে প্রধান চরিত্র করিয়া তুলিয়াছেন এবং তাঁহার কল্পিত বীরাঙ্গনাদের মধ্যে বিমলাই প্রথমা। শশিশেখর বারবার অবৈধ প্রণয়ে লিপ্ত হইতেছে—সেই শশিশেখরকে মহামহোপাধ্যায় অভিরামস্বামী করিয়া তুলিয়া তাঁহার চরণে বঙ্কিম রাজরাজন্যগণের মস্তক লুণ্ঠিত করাইয়াছেন। রাজপুতবীরের সহিত কেবল বাঙালি কন্যার নয়—পাঠানযুবতীর সহিত রাজপুত যুবকের প্রণয়ের কাহিনি লিখিতে তিনি ইতস্তত করেন নাই। জগৎসিংহ পিতার অনুমতি না লইয়া জারজার গর্ভজাতা তিলোত্তমাকে বিবাহ করিলেন। বঙ্কিম এখানে সামাজিক সংস্কারের উপর প্রেমকেই বিজয়ী করিয়া তুলিয়াছেন।

সর্বোপরি তিনি কামান্ধ ব্রাহ্মণপণ্ডিতের মুখে শূদ্রী প্রণয়িণীর উচ্ছিষ্ট অন্নগ্রাস তুলিয়া দিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও চরিত্রবল না থাকিলে সে যে একটা দাসীর চরণতলে পতিত হইতে পারে, প্রাণ বাঁচাইতে মুসলমান হইতে পারে, একথা স্বীকার করিতে তাঁহার সংস্কারে বাধে নাই। চরিত্রহীন মূর্খ ব্রাহ্মণকে লইয়া অবজ্ঞাময় নিষ্ঠুর ব্যঙ্গ করিতে তিনি উৎসাহই বোধ করিয়াছেন।

Scanned with CamScanner

দেবতার মন্দিরের মধ্যে যুবক-যুবতীর প্রণয় সঞ্চার ঘটাইতে বঙ্কিমের পা আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে নাই। প্রেম যতই পবিত্র হউক, প্রথম দর্শনে তো তাহা রূপমোহের উপরকার স্তরে আরোহণ করে নাই—তাহার শুচিতাও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

'দুর্গেশনন্দিনী'তে আমরা বঙ্কিমের উদার সংস্কারমুক্ত শিল্পীজনোচিত বিরাট মনের পরিচয় পাই। মানবতার ও মানবহৃদয়ের প্রতি যে গভীর শ্রদ্ধা শিল্পী-ধর্মের অন্তর্গত—অন্য পুস্তকে তাহার যতই অভাব থাকুক, 'দুর্গেশনন্দিনী'তে তাহা নাই।

ভারতীয় সাহিত্যে নায়িকার রূপবর্ণনার একটা প্রথা ছিল। তাহাতে রূপ ঠিক ফুটিত না;—রূপবর্ণনাচ্ছলে কবিগণ নিজেদের মামুলি অলংকার প্রয়োগের কৃতিত্ব দেখাইতেন মাত্র। বঙ্কিমচন্দ্র ওই শ্রেণিরই বাক্যালংকার-সাহায্যে রূপবর্ণনার প্রথাকে আশমানির রূপ-বর্ণনা-প্রসঙ্গে ব্যঙ্গ করিয়াছেন। ব্যঙ্গ-রসিকতার নিদর্শন হিসাবে ইহা উৎকৃষ্ট সাহিত্যই হইয়াছে। কিন্তু বঙ্কিম নিজে রূপবর্ণনার এই প্রথাটি ত্যাগ করিতে পারেন নাই—অবশ্য বর্ণনাভঙ্গি পূর্বসূরিদের অন্ধ অনুকরণ মাত্র নয়। কিন্তু তাহাতেও রূপ ঠিক ফুটে নাই। ইহাতে বঙ্কিমের ভাষার মুন্‌সিয়ানাই প্রকাশিত হইয়াছে। আর একটি জিনিস ফুটিয়াছে—তাহা বঙ্কিমের নিজের রূপমুগ্ধতা। পূর্বগামী কবিদের মতো বঙ্কিমের রূপবর্ণনা নিরাবেগ বা উদাসীন বর্ণনামাত্র নয়—রীতিমতো আবেগময়। রমণীরূপবর্ণনার উৎসাহ ও উল্লাসের মধ্যে বঙ্কিমের কবি-মানসের পরিচয় পাওয়া যায়। শিল্পী বঙ্কিম ছিলেন রূপেরই উপাসক। রমণীরূপ তাঁহার চিত্ত কীরূপ রসাবিষ্ট করিত, আয়েষা, তিলোত্তমা ও বিমলার রূপবর্ণনাচ্ছলে তিনি তাহারই আভাস দিয়াছেন। পরোক্ষে ও অপরোক্ষে তিনি স্বীকার করিয়াছেন—প্রেম শুচিই হউক, আর অশুচিই হউক, সকল প্রেমেরই জন্ম রূপমোহে।

দুর্গেশনন্দিনীতে মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণের বালাই নাই। কেবল 'অঙ্গুরীয়—প্রদর্শন' শীর্ষক অধ্যায়ে একটু চেষ্টা দেখা যায়—তাহাতে মনে হয়, বঙ্কিম প্রথম উপন্যাসেই বুঝিয়াছিলেন—কথাসাহিত্যে ইহারও প্রয়োজন আছে।*

স্বীকার করি, 'দুর্গেশনন্দিনী'র অনেক স্থল কলা শ্রীসংগত হয় নাই। কিন্তু কতকগুলি চিত্রে বঙ্কিম প্রথম শ্রেণির শিল্পীর পরিচয় দিয়াছেন—যেমন পাঠানগণের দুর্গ-প্রবেশ, বীরেন্দ্রসিংহের বিচারদৃশ্য, কতলুখাঁর বিলাসলীলা, বিমলার রহিম-সম্মোহন, ওস্‌মান-জগৎসিংহের দ্বন্দ্বযুদ্ধ, আয়েষার তিলোত্তমা-সম্ভাষণ ইত্যাদি চিত্রে বঙ্কিম যথেষ্ট কলা-কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। বঙ্কিম এই পুস্তকে ঐতিহাসিক আবেষ্টনী সৃষ্টিতেও যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, কিন্তু প্রাকৃতিক আবেষ্টনী সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করেন নাই।

বঙ্কিম যে ভাষায় 'দুর্গেশনন্দিনী' লিখিয়াছেন—তাহা তাঁহার নিজস্ব ভাষা নয়। তখনও বঙ্কিম নিজের ভাষা খুঁজিয়া পান নাই। এ ভাষার ভঙ্গি কতকটা অক্ষয়কুমার-বিদ্যাসাগরের রচনা, কতকটা সে সময়ের উপকথার পুস্তকগুলি, কতকটা বিবিধ সংস্কৃত পুস্তকের অনুবাদ ইত্যাদির দ্বারা প্রভাবিত। তখন বাঙ্গালায় নব নব ভাব প্রকাশের উপযোগী ভাষার সৃষ্টি হয় নাই। ভাব প্রকাশ করিতে তখনকার লেখকদের কী দারুণ ক্লেশই না স্বীকার করিতে হইয়াছে! 'দুর্গেশনন্দিনী'-তেও সে কৃচ্ছ্র চেষ্টার পরিচয় পাওয়া যায়।

---

* ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "বঙ্কিম তাঁহার এই প্রথম উপন্যাসে কতকটা ঐতিহাসিক ঘটনা-বাহুল্যের জন্য ও কতকটা রোমান্স-সুলভ অপ্রত্যাশিত পরিণতির অবতারণার জন্য ও গল্পাংশের আকর্ষণ বৃদ্ধি করিবার জন্য এরূপ মনস্তত্ত্বমূলক বিশ্লেষণে হস্তক্ষেপ করেন নাই।"—বঙ্গসাহিত্যের উপন্যাসের ধারা।

Scanned with CamScanner

দৃষ্টান্ত—

১. একজন প্রাচীন মোগল সৈনিক কহিলেন, মহারাজ, যথায় তাবৎ সেনা পাঠাইতেও আশঙ্কা, তথায় অল্পসংখ্যক সেনার দ্বারা কোন্ কার্য সাধনা হইবেক? মানসিংহ কহিলেন—অল্প সেনা সম্মুখ রণে অগ্রসর হইতে পাঠাইতে চাহিতেছি না। ক্ষুদ্রবল অস্পষ্টে থাকিয়া গ্রামপীড়নাসক্ত পাঠানদিগের সামান্য দলসকল কতক পরিমাণে দখলে রাখিতে পারিবেক।

২. ইতিপূর্ব্বে যুবরাজ যুদ্ধসম্বন্ধীয় কার্যসম্পাদনে বিষ্ণুপুর অঞ্চলে যাইয়া ত্বরিত এক শত অশ্বারোহী সেনা লইয়া পিতৃসমক্ষে যাইতেছিলেন, অপরাহ্ণে সমভিব্যাহারিগণের অগ্রসর হইয়া আসিয়াছেন।

৩. অভিরাম স্বামী মহাসমারোহের সহিত দোহিত্রীকে জগৎসিংহের পাণিগ্রহীত্রী করিলেন। তিলোত্তমার পিতৃবন্ধুও অনেকে আহ্বান প্রাপ্ত হইয়া আনন্দ-কার্যে আসিয়া আমোদ আহ্লাদ করিলেন।

৪. সে দৃষ্টি কোমল, কেবল স্নেহব্যঞ্জক তিরস্কারণভিলাষের চিহ্নমাত্রে বর্জিত।

৫. জগৎসিংহ অর্থব্যয় ও শারীরিক ক্লেশ স্বীকার করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে যত্ন কেবল পূর্ব সম্বন্ধের স্মৃতিজনিত কি, যে সে অপরাপর কারণে মানসিংহ প্রভৃতি সেইরূপ যত্ন প্রকাশ করিয়াছিলেন সেই সেই কারণ-সম্ভূত, কি পুনঃ সঞ্চারিত প্রেমানুরোধে উৎপন্ন, তাহা কেহই বুঝিতে পারে নাই।

এইরূপ অনেক স্থলে ভাবপ্রকাশের কৃচ্ছ্র চেষ্টা দেখা যায়।

অনেক সময় বঙ্কিম এক-একটি পূর্ণ বাক্যকেই 'সমস্ত' পদে পরিণত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। যেমন—অনিবার্য্যতৃষ্ণাকাতরলোচনে। যোদ্ধৃবৃত্তি-অবলম্বনকরণাশয়ে। পীবরাংস-সংসক্তা। বিদ্যুদগ্নিগর্ভমেঘবৎচঞ্চল। সন্ধ্যাসমীরণকম্পিত-নীলোৎপলতুল্য। প্রস্ফুটশারদাস-রসীরুহের মন্দান্দোলনস্বরূপ। বিদ্যুদ্দাম-স্ফুরণ-চকিত-কটাক্ষ-নিক্ষেপ।

বঙ্কিম মুহুর্মুহু তদ্-শব্দের সহিত সমাসবদ্ধ পদ ব্যবহার করিতেন—

মুসলমানেরা অবাধে তদ্রাজ্য শাসন করিতে থাকেন। সুলতান বাবর...তৎসিংহাসনে আরোহণ করেন। পরবৎসর উৎকল-বিজিগীষু হইয়া তদভিমুখে যাত্রা করিলেন। মানসিংহ তৎপরামর্শানুবর্ত্তী হইয়া...প্রতীক্ষায় রহিলেন।

বঙ্কিমের নিজের স্বচ্ছ সরল ভাষাভঙ্গির মুকুলিত রূপ এই গ্রন্থের অনেক স্থলে দৃষ্ট হয়। যেমন—

১. বিমলা নিজ কক্ষে বসিয়া বেশভূষা করিতেছিলেন। পঞ্চত্রিংশ-বর্ষীয়ার বেশভূষা? কেনই বা না করিবে? বয়সে কি যৌবন যায়? যৌবন যায় রূপে আর মনে। যাহার রূপ নাই বিংশতি বর্ষ বয়সেও সে বৃদ্ধা। যাহার রূপ আছে সে সকল বয়সেই যুবতী। যাহার মনে রস নাই সে চিরকাল প্রবীণ। যার রস আছে, সে চিরকাল নবীন। বিমলার রূপে শরীর রূপে ঢলঢল করিতেছে, রসে মন টলটল করিতেছে। বয়সে আরও রসের পরিপাক।

২. দিন যাবে। তুমি যাহা ইচ্ছা করো, দিন যাবে, রবে না। পথিক, বড়ো দারুণ ঝটিকা-বৃষ্টিতে পতিত হইয়াছ? বৃষ্টিতে প্লাবিত হইতেছে? অনাবৃত শরীরে

Scanned with CamScanner

কষাঘাত হইতেছে? আশ্রয় পাইতেছ না? ক্ষণেক ধৈর্য্য ধর, এ দিন যাবে, রবে না। দুর্দ্দিন ঘুচিবে, সুদিন আসিবে—ভানুদয় হইতে কালি পর্যন্ত অপেক্ষা করো।

কাহার না দিন যায়? কাহার দুঃখ স্থায়ী করিবার জন্য দিন বসিয়া থাকে? তবে কেন রোদন করো? তিলোত্তমা ধুলায় পড়িয়া আছে—তবু দিন গেল। বিমলার হৃৎপদ্মে প্রতিহিংসা-কালফণী বসতি করিয়া সর্বশরীর বিষে জর্জ্জর করিতেছে। এক মুহূর্তে তাহার দংশন অসহ্য। এক দিনে কত মুহূর্ত! তথাপি দিন কি গেল না?

কতলু খাঁ মসনদে, শত্রুজয়ী। সুখে দিন যাইতেছে, দিন রহে না। জগৎসিংহ রুগ্ন-শয্যায়, রোগীর দিন কত দীর্ঘ কেনা জানে? তথাপি দিন গেল।

স্থলে স্থলে বঙ্কিম এমন ভঙ্গিতে লিখিয়াছেন, পড়িলে মনে হয় সংস্কৃত কাব্যের বুঝি অনুবাদ পড়িতেছি—

তিলোত্তমা একাকিনী কক্ষবাতায়নে বসিয়া কী করিতেছেন? সায়াহ্নগগনের শোভা নিরীক্ষণ করিতেছেন? তবে ভূতলে চক্ষু কেন? নদীতীরস্থ কুসুম-সুবাসিত বায়ু সেবন করিতেছেন? তবে ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘাম হইবে কেন? মুখের এক পার্শ্ব ব্যতীত তো বায়ু লাগিতেছে না। গোচারণ দেখিতেছেন? তাহাও নয়, গাভীগণ ত একে একে গৃহে আসিল। কোকিলরব শুনিতেছেন? তবে মুখ এত ম্লান কেন? তিলোত্তমা কিছুই দেখিতেছেন না, শুনিতেছেন না, চিন্তা করিতেছেন।

পূর্বরাগের লক্ষণাদি বর্ণনাতেও বঙ্কিম ভারতীয় পূর্ব্ব কবিগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন। তবে এ সম্বন্ধে বঙ্কিমের নিজের মৌলিকতাও কিছু আছে। (১ম খণ্ড। ৭ম পরিচ্ছেদে)

বঙ্কিমের ভাষা অনেক স্থলে অলংকৃত। অলংকার-প্রয়োগে বঙ্কিমের মৌলিকতা আছে, কোথাও কোথাও অবশ্য সংস্কৃত কবিদের অনুসরণ করিয়াছেন।

দৃষ্টান্ত—

১. সে যেন ভাণ্ডস্থ ঘৃত। মদন-আগুন যত শীতল হইতেছে—দেহখানি ততই জমাট বাঁধিতেছে।

২. যেমন শীতার্ত্ত ব্যক্তির অঙ্গ হইতে ক্রমে ক্রমে বেলাধিক্যে রৌদ্র সরিয়া যায়। আয়েষা সেইরূপ ক্রমে ক্রমে জগৎসিংহ হইতে আরোগ্যকালে একটু একটু করিয়া সরিয়া যাইতে লাগিলেন।

৩. আমি বন্দি হই, আমাকে কারাগারে স্থান দিন। এ সংসারে দয়ার শৃঙ্খল হইতে আমাকে মুক্ত করুন। আর যদি বন্দি না হই, তবে আমাকে হেমপিঞ্জরে আবদ্ধ রাখার প্রয়োজন কি?

তিলোত্তমার স্বপ্নকাহিনিটি আগাগোড়া রূপক।*

*এইরূপ রূপক-স্বপ্ন সাধারণ উপন্যাসের পক্ষে অনুপযোগী হইলেও রোমান্সের রসপুষ্টির পক্ষে বিশেষ উপযোগী। ইহা দুর্গেশনন্দিনীর কাব্যাঙ্গের পরিপোষক। ইহাতে বঙ্কিমের কবিমানসের প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। (বঙ্গসাহিত্যের উপন্যাসের ধারা)

Scanned with CamScanner

এইরূপ বহুস্থল হইতেই উদ্‌ধৃত করিয়া দেখানো যাইতে পারে—প্রথম শ্রেণির রসশিল্পীর উপযুক্ত ভাষার সূত্রপাত হইয়াছে বঙ্কিমের প্রথম উপন্যাসেই।

'দুর্গেশনন্দিনী' ঔপন্যাসিক বঙ্কিমের প্রথম কল্পনা। ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র যখন খুলনায় ডেপুটি, তখন 'দুর্গেশনন্দিনী' রচিত হয়। ২-৩ বৎসর পর ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে উহা প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাস রচনা করিয়া বঙ্কিম অগ্রজদের দেখিতে দেন—তাঁহারা ইহাকে উৎকৃষ্ট গ্রন্থ মনে না করিলেও প্রকাশযোগ্য মনে করেন।

'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশিত হইলে দেশীয় পণ্ডিতসমাজ ইহার তেমন আদর করেন নাই। কেহ বলিলেন—ভাষায় ব্যাকরণ ভুল অজস্র, কেহ বলিলেন—ইহা বিলাতি ভাবে পরিপূর্ণ। ইংরেজিনবীশরা এই পুস্তক পড়িয়া খুবই খুশি হইলেন। যে দেশের সাহিত্যে দেবতার মহিমা ছাড়া আর কিছু ছিল না—সে দেশের সাহিত্যে মানুষের অন্তর্নিহিত মহিমার ঘোষণা দেখিয়া, তাহার জীবনরহস্য ও হৃদয়াবেগের প্রাধান্য লক্ষ করিয়া তাঁহারা খুশিই হইলেন।

যে দেশে মানব জীবনটাকে অসার বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল—সে দেশের সাহিত্যে মানব-হৃদয়কে এত গৌরব পূর্বে কেহ দেয় নাই। মানব জীবনের ভিতরে যে কত রহস্য, কত বৈচিত্র্য, কত গভীরতা, কত জটিলতা—তাহার প্রথম আভাস দিলেন বঙ্কিম দুর্গেশ-নন্দিনীতে। পুরাণ ও তদনুগত সাহিত্যে দেবাধীন মানুষের অদৃষ্টের কথাই থাকিত—মানুষের স্বাতন্ত্র্য ও পুরুষাকারের কথা থাকিত না—'দুর্গেশনন্দিনী'তে তাঁহারা এই কথা প্রথম পাইলেন। প্রণয়ের স্বাধীনতা, উচ্চাদর্শ ও গৌরব প্রচারে বঙ্কিমের অসাধারণ সাহস দেখিয়া তাঁহারা মুগ্ধ হইলেন। ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্যের বহুবিধ জীর্ণ সংস্কারকে জয় করিয়া —রক্ষণশীলতার সকল শাসন, অনুশাসনকে অবহেলা করিয়া বঙ্কিমের লেখনীকে সসাহসে রসোত্তীর্ণ হইতে দেখিয়া তাঁহারা জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন।

যে দেশে কথাসাহিত্যের পুঁজি ছিল—পারশি হইতে অনুবাদিত তোতার ইতিহাস, হাতেম তাই, চাহার দরবেশ, আর সংস্কৃত হইতে অনূদিত কাদম্বরী, শকুন্তলা, বৃহৎকথা; ইহা ছাড়া দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথাভ্রমণ, অঙ্গুরীয়-বিনিময় ইত্যাদি দুই-একখানি তৃতীয় শ্রেণির পুস্তক—সে দেশে দুর্গেশনন্দিনীর আবির্ভাব যে একটা মহামহোৎসবের ব্যাপার সে বিষয়ে সন্দেহ কি? সাত বৎসর আগে 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকখানি পূর্ববর্তী গ্রন্থগুলির তুলনায় শ্রেষ্ঠ হইলেও সর্বাঙ্গসুন্দর কথাসাহিত্যের পুস্তক বলিয়া গণ্য হয় নাই। বঙ্কিম নিজে এই গ্রন্থের সমাদর করিয়াছিলেন—কলাসৌষ্ঠবের জন্য নয়—ভাষার সরলতা, স্বচ্ছতা ও স্বাভাবিকতার জন্য।

দুর্গেশনন্দিনীকেই বঙ্গভাষার সর্বপ্রথম রসগর্ভ কথাসাহিত্যের পুস্তক বলিতে হয়। বিশ্বাস্যতা-সৃষ্টি কথাসাহিত্যের একটি প্রধান অঙ্গ। সামাজিক উপন্যাসে যথাযথ বিবরণী দেওয়ার ভঙ্গিতে অস্বাভাবিক, অসংযত, অসম্ভব, অপ্রাসঙ্গিক, অতিপ্রাকৃত ব্যাপার ও ঘটনাদি বর্জন করিয়া কল্পিত জিনিসের বিবৃতি দেওয়া হয়। বহু মিথ্যা কথা চালাইবার জন্য বহু সত্য কথাও বলা হয়। ঐতিহাসিক উপন্যাসে ঐতিহাসিক অংশই সত্য বলিয়া

Scanned with CamScanner

স্বভাবত বিশ্বাস্যতা উৎপাদন করে। ওই সঙ্গে কাল্পনিক ব্যাপারগুলিকেও ঐতিহাসিক সত্যের সহিত চালানো যায়—যথাযথ বর্ণনা দেওয়ার ক্লেশও স্বীকার করিতে হয় না। বিশেষত Romance শ্রেণির এই সকল কথাসাহিত্যের পুস্তকে বিশ্বাস্যতা উৎপাদনের জন্য কোনো চেষ্টার প্রয়োজন হয় না। পাঠক এই শ্রেণির পুস্তকে কাব্যরসই আস্বাদ করে—কাঁটায় কাঁটায় সংগতি-অসংগতির বিচার করে না। যাহাই হউক—দুর্গেশনন্দিনীর আখ্যানবস্তুকে ঐতিহাসিক আবেষ্টনীর মধ্যে রক্ষা করিয়া এবং কয়েকটি ঐতিহাসিক চরিত্রের সাহায্য লইয়া বঙ্কিমচন্দ্র ইহাকে একটা ইতিবৃত্তলভ্য বিশ্বাস্যতা দান করিয়াছেন।

ইহার ঐতিহাসিক সূত্র এই—

আকবরের সময়ে বঙ্গদেশ বিজিত হইলেও ওড়িশার পাঠানরা কতলুখাঁর নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গে উপদ্রব ও লুণ্ঠন করিয়াছিল। মানসিংহ পাঠান দমনের জন্য তখন বঙ্গদেশে ছিলেন। মানসিংহ তাঁহার পুত্র জগৎসিংহকে পাঠানদের দমনের জন্য বাঁকুড়া অঞ্চলে প্রেরণ করেন। পাঠানেরা একটি দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সন্ধির প্রস্তাব পাঠায়। কিন্তু ওড়িশা হইতে বহু সৈন্য আসিয়া পড়ায় তাহাদের সাহায্যে পাঠানরা জগৎসিংহকে বন্দি করিয়া বিষ্ণুপুরে লইয়া যায়। জগৎসিংহ যখন বিষ্ণুপুরে বন্দি—তখন কতলুখাঁর রোগে (অস্ত্রাঘাতে নয়) মৃত্যু হয়। পাঠানরা তখন নেতৃহীন হইয়া জগৎসিংহের সঙ্গে সন্ধি করে।

এইটুকু ইতিহাস বঙ্কিমের সম্বল। ইহা ছাড়া একটু কিংবদন্তি আছে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার পিতামহের ভ্রাতার মুখে শুনিয়াছিলেন—বিষ্ণুপুর ও জাহানাবাদের মধ্যে মান্দারণ গ্রামে একটি গড় ছিল। সেই গড়ে একজন প্রবল-প্রতাপ জমিদার বাস করিতেন। ওই অঞ্চলে তিনি শুনিয়াছিলেন ওড়িশার পাঠানরা মান্দারণ গড় দখল করিয়া জমিদার ও তাঁহার পরিবারবর্গকে ওড়িশায় বন্দি করিয়া লইয়া যায়। কুমার জগৎসিংহ তাঁহাদের উদ্ধারের জন্য মানসিংহ কর্তৃক প্রেরিত হন।

এই দুইটি সূত্র হইতে আমরা কতলু খাঁ, জগৎসিংহ ও গড় মান্দারণ পাইতেছি। বাকি সমস্তই কল্পনাপ্রসূত। ওসমান বঙ্কিমের সৃষ্টি। বিমলা, আয়েষা, তিলোত্তমা ইত্যাদি নারীচরিত্রগুলি সবই বঙ্কিমের কল্পনাপ্রসূত।

এ ক্ষেত্রে দুর্গেশনন্দিনীকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা যায় না। Romance সৃষ্টির জন্য বঙ্কিম দেশকালগত ঐতিহাসিক আবেষ্টনী মাত্র গ্রহণ করিয়াছেন—ইহা ছাড়া কিছুই বলা যায় না। জগৎসিংহের অভিযান ও বন্দিদশা একটি সূত্র মাত্র জোগাইয়াছে।

Scanned with CamScanner